সংবাদ

তারিখ ...0..4 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭ ....

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং তার প্রয়োগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৭ প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। এই আইনের অধীনে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে ২৫ কোটি টাকা, মাত্র একটি ক্যাম্পাস, খণ্ডকালীন শিক্ষক অনধিক ২০ শতাংশ সীমিত রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল ডিগ্রিও দিতে পারবে না। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট বিক্রি এবং নিম্নমানের শিক্ষা দেয়ার মতো অপকর্মে নিয়োজিত আছে বলে অভিযোগ পাওয়ার পর বর্তমান সরকার এই আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। খসড়া আইনে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আইন অমান্য করলে ৫ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ লাখ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইন শিগগিরই উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদিত হয়ে আইনে পরিণত হতে পারে।

১৯৯২ সালে 'প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এক্ট'- এর অধীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কার্যক্রম শুরু করে। আইনটি ১৯৯৮ সালে সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনের ফাঁকফোকর ব্যবহার করে বেশকিছু অসাধু ব্যক্তি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কোন মানের তোয়াক্কা না করে ডিগ্রি বিক্রি করছে। প্রস্তাবিত আইনের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইতোমধ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬টি শাখাকে বেআইনি ঘোষণা করেছে। প্রায় ১০০টি 'আউটার ক্যাম্পাস' এবং ৪০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজকে বেআইনি ঘোষণা করে চলতি বছর থেকে ছাত্রভর্তি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বর্তমান আইন উপদেষ্টা মইনুল হোসেনের নেতৃত্বে ২০০৩ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়ম তদন্ত করার জন্য জোট সরকার একটি কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়াসহ বেশ কয়েকটি সুপারিশ করে। কিন্তু জোট সরকার তার মন্ত্রী, এমপি ও আমলাদের চাপে কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করেনি। ফলে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাই দুর্নামের ভাগী হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নতুন আইন করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে উচ্চশিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিচ্ছে। সরকারের এই উদ্যোগকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, কোন মহলের প্রভাবে খসড়া আইনটিকে অতিমাত্রায় নমনীয় করে ফেলা হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সূত্র বলছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২ হাজার শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। তাদের অনেকে আবার একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। এতে পাবলিক ও বেসরকারি উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ফলে খণ্ডকালীন শিক্ষকতাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি বাইরে কোন অর্থকরী কাজ করেন, তবে প্রাপ্ত অর্থের একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা দেয়ার কথা; কিন্তু অনেক শিক্ষকই তা করেন না। এদিকটাও মনিটর করা দরকার। অন্যদিকে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের ব্যাপারেও কিছু যুক্তিসঙ্গত সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে 'এসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের' পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তারা ১৯৯৮ সালের সংশোধনীসহ ১৯৯২ সালের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এক্টের সংশোধনের প্রতি সমর্থন জানাবে। কিন্তু নতুন কোন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এক্টের তীব্র বিরোধিতা করছে। তাদের মতে প্রস্তাবিত নতুন আইন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চরিত্র বদলে দেবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রস্তাবিত আইনের খসড়া নাকি তাদের মতামত না নিয়েই প্রণয়ন করা হয়েছে। অথচ এ কথা কে না জানে যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এতদিন প্রায় নিয়ন্ত্রণহীনভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শর্ত পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও নানা অজুহাতে শর্ত ভঙ্গ করে চলেছে। এ কারণেই নতুন আইনের প্রতি তাদের বিরোধিতা। আমরা আশা করব শুধু নতুন আইন প্রণয়ন নয়, সেই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করারও উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের উচ্চশিক্ষা পদ্ধতিকে কলুষমুক্ত করার জন্য বিষয়টি জরুরি।